দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 22 AUG 2016
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৪

অধ্যাপক ড. শরীফ এনামুল কবির

আমাদের শিক্ষার হালচাল

প্রয়োজন একটি আদর্শ শিক্ষা ব্যবস্থা এবং শিক্ষার সকল স্তরে সরকারের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ। একজন চাইলেই একটি স্কুল খুলতে যেনো না পারে, মন চাইল বিশ্ববিদ্যালয় খুলে বসলো— যিনি পড়াচ্ছেন তিনিই ডিগ্রি দিচ্ছেন, যাচাই-বাছাই করার প্রয়োজন হচ্ছে না। শিক্ষক ঠিকাদারি করছেন, পড়াচ্ছেন না, অভিভাবক আগের মতো অফিস থেকে ফিরে সন্তানকে নিয়ে না বসে অন্য কিছু করছেন, নানাভাবে অর্জিত টাকা তুলে দিচ্ছেন কোচিং ব্যবসায়ীর হাতে

বেশ কিছুদিন সমগ্র দেশের রাস্তা-ঘাট, চায়ের টেবিল-বাস-স্টিমার-রেলের কম্পার্টমেন্ট, অফিস-আদালত এবং যেখানে জাতীয় সব সমস্যার সমাধান হয় সেই টিভি-টকশো সর্বত্র একটিই প্রসঙ্গ নিয়ে কথার তুবড়ি ছড়াচ্ছে সকলে। কী হচ্ছে আমাদের স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে? ছাত্র জঙ্গি, শিক্ষক জঙ্গি, কী পড়ানো হচ্ছে আজকাল এ সব প্রতিষ্ঠানে। শিক্ষার্থীদের ছোঁ মেরে নিয়ে যাচ্ছে যেনো কারা, উধাও হয়ে যাচ্ছে তারা। কিন্তু কোথাও নেই হারানো বিজ্ঞপ্তি। অভিভাবকরা দুশ্চিন্তায় বেদিশা। এতোদিন তারা গর্ব করে বলতেন-আমার ছেলেটা ভাই মাশাল্লাহ, নামাজ-রোজায় মতি আছে। এখন কি বলেন জানা নেই। তবে শিক্ষকের চৌদ্দগোষ্ঠির নরকবাসের ব্যবস্থা করতে যে নাছোড় তা বলা যায় নিশ্চিত করে। ভাগ্যিস, দেশে দুটো সন্ত্রাসী হামলা হয়েছিলো না হলে দেশের ভিতরের এই চেহারাটা স্পষ্ট করে দেখার সৌভাগ্য হতো না এদেশের জনমানুষের! প্রতিবছর পরীক্ষার ফল বেরোয় মিষ্টির দোকানীর চেহারা মিষ্টির মতো টসটস করে। মাস্টার সাহেব যিনি কোচিংয়ের মালিক তাঁর ফ্ল্যাট বাড়ে, জমির পরিমাণ বাড়ে, কোচিং সেন্টারের সংখ্যা বাড়ে। অভিভাবকের পকেটে উঠে সন্তানের জিপিএ-৫, মাসকাবারে বাড়ে দেনা। জাতির শিক্ষা-পরিসংখ্যানে হার বাড়ে সাক্ষর লোকের—আমরা শিক্ষিত হবার সুযোগ পাই না। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর অতন্দ্র চোখের দৃষ্টি এড়িয়ে দেশে যে অশিক্ষিতের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে তা শিক্ষার উচ্চস্তরে এসে ধরা পড়ছে। কিন্তু তখন আর কিছু করার নেই, ফাঁপা বেলুন, আকাশে উড়ানো ছাড়া উপায় থাকে না। সত্যি সত্যি যে, শিক্ষার দুরবস্থা অবিশ্বাস্য অশিক্ষার স্তরে নেমেছে নিম্নের ঘটনা তার প্রমাণ। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান এক অনুষ্ঠানে বলেছিলেন চাকরির একটি ইন্টারভিউ বোর্ডের মজাদার গল্প। আসলে গল্প নয়, তাঁর অভিজ্ঞতার একটি নমুনা সেটি—

চাকরিপ্রার্থী ছাত্রটি দেখতে স্মার্ট। এসএসসি থেকে শুরু করে মাস্টার্স পর্যন্ত প্রতিটি স্তরেই প্রথম শ্রেণির ফলাফল। ইংরেজিতেও ভাল জ্ঞান। চমৎকার বলতে পারে। প্রাথমিক কথাবার্তা শেষে প্রশ্ন জিজ্ঞাসার পালা। প্রথমেই বাংলাদেশের অভ্যুদয় প্রসঙ্গে তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো— আচ্ছা বাবা, বলো তো, মহান স্বাধীনতা যুদ্ধ কত সালে অনুষ্ঠিত হয়? স্যার, ইট ওয়াজ নাইনটিন সেভেনটি ওয়ান। গুড। আচ্ছা, বলো তো, স্বাধীনতা যুদ্ধে শহীদ বীরশ্রেষ্ঠের সংখ্যা কত? সাতজন স্যার। ভেরি গুড। আচ্ছা, তাদের নামগুলো বলো তো বাবা। স্যার, ইটস সো ইজি। দে আর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, জিয়াউর রহমান... (এদিক সেদিক তাকাউঁকি, মনে করার চেষ্টা আর কি!)। ইন্টারভিউ বোর্ডে উপস্থিত পরীক্ষকদের চোখ তো কপালে ওঠার অবস্থা। সকলে মিলে প্রার্থীকে অভয় দেবার চেষ্টা করা হলো এভাবে—, একটু চেষ্টা করো বাবা। পারবে তো। তুমি তো খুব ব্রিলিয়ান্ট! খুশিতে গদগদ হয়ে শিক্ষার্থীর উত্তর—, জ্বি স্যার। একটু ঘাবড়ে গেছিলাম। আরও বীরশ্রেষ্ঠ হলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া... (এবার মাথা চুলকানি। ভাবখানা এমন, এত সহজ জিনিস কেন যে ভুলে যাই?) হুম বাবা। তাড়াতাড়ি বলো। বুকে ব্যথা হচ্ছে। এটাক্ করবো মনে হয়। মাথা চুলকাতে চুলকাতে শিক্ষার্থীর উত্তর, স্যার, জানি তো। মনে করতে পারছি না এখন। আসলে একটু ঘাবড়ে গিয়েছি তো। কেন বাবা, তোমার দাদা আর নানার নাম যোগ করেও সাতজন হচ্ছে না?

গল্পের মতো এই বাস্তব আমাদের হাস্যরসের খোরাক হলেও এতো জাতির সর্বনাশের অশনি সংকেত। এমন যে যুবক তার পক্ষে বিপথগামী হওয়া কী কোনো অসম্ভব কিছু? বাংলাদেশের অভ্যুদয় সম্পর্কে দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া একজন শিক্ষার্থীর এই যদি হয় জ্ঞান তবে নাগরিক যোগ্যতার প্রশ্নটি ওঠে না কী? কী শিখছে তারা? কী পড়াচ্ছি, শিখাচ্ছি আমরা? শিক্ষার্থীদের সিলেবাসেই বা কী আছে? এসএসসি, এইচএসসি পরীক্ষায় শিক্ষার্থীরা মোটামুটি ভাল করছে। মানে তাদের ফলাফল চমৎকার ও আকর্ষণীয়। জিপিএ ফলাফলের যুগে প্রায় বেশিরভাগেরই ফল জিপিএ-৫। পাঠ্যবইয়ের কয়েকটি অধ্যায় মুখস্থ নয়, ঠোঁটস্থ থাকে তাদের। আবার এখনকার শিক্ষার্থীরা যে পড়াশোনার পেছনে সময় ব্যয় করছে না, তা কিন্তু নয়। বরং, কচি বয়স থেকে পড়ার চাপে একরকম তারা বাইরে বের হবারই সময় পাচ্ছে না। খোলা মাঠে ডাংগুলি, গোল্লাছুট এমনকি ক্রিকেট, ফুটবলের মত আধুনিক খেলাও এখন তাদের কাছে স্বাপ্নিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর ঐতিহ্যবাহী বাঙালি খেলাগুলোর নাম এখন তারা গুগল থেকে জানে। দেখে নেয় ইউটিউব থেকে। প্রশ্ন হচ্ছে, এত্ত সময় ধরে ব্যস্ত তারা পড়াশোনা নিয়েই, তাহলে কী পড়ছে তারা? এত পরিশ্রম করার পরেও কেন স্বাভাবিক বিষয়গুলোতে তাদের মাথা খোলে না।

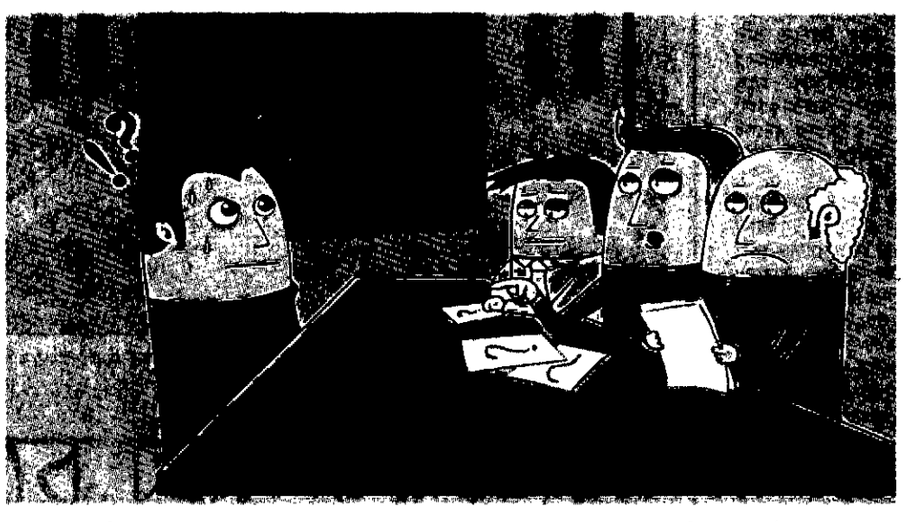

আজকাল কি দেখি। সকাল ১০টা থেকে স্কুল-কলেজের ক্লাস হলেও রাত পোহালেই ব্যাগভরা বই কাঁধে স্কুল, কলেজের শিক্ষার্থীদের দেখা মিলে। আবার বিকেল চারটার পর সব স্কুল-কলেজ ছুটি হলেও বিকালবেলা এমন কি সন্ধ্যার পরও বই নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের আসা-যাওয়া করতে দেখা যায়। ছাত্রছাত্রীদের প্রাইভেট অথবা কোচিং সেন্টারে যাওয়ার মূল উদ্দেশ্য ভাল ফলাফল। যে কোনোভাবেই সর্বোচ্চ জিপিএ তাদের পেতেই হবে। আবার অনেকক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের তুলনায় এক্ষেত্রে মাথাব্যথা বেশি অভিভাবকদের। তাদের সন্তান যদি জিপিএ-৫ না পায়, কেবল-৫ নয়, যদি গোল্ডেন জিপিএ-৫ না পায়, তাহলে ক্লাব, টেনিস বা তাসের মাঠে ওই অভিভাবক নাকি ছোট হয়ে যান! ভাবিদের সঙ্গে

আড্ডায় মা নাকি মাথা তুলে কথা বলতে পারেন না, কেন তার ছেলেমেয়ে গোল্ডেন জিপিএ-৫ পেলো না! মর্যাদা রক্ষার জন্য যতো পারো চাপ প্রয়োগ করো বাচ্চাদের উপর। যে কোনো মূল্যেই যেন তারা কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পায়, এটাই বাবা-মায়ের চাওয়া হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিক্ষার্থীরা কি শিখছে তাতে তাদের মাথাব্যথা নেই। আবার শিক্ষার্থীরাও যেন রোবট হয়ে যাচ্ছে। হয়ে যাচ্ছে অনুভূতিহীন। যেন তারা মেনেই নিয়েছে পড়াশুনা করতে হলে প্রাইভেট কোচিংয়ে যেতেই হবে। শিশুদের মন-মানসিকতা, সময়ের সঙ্গে বয়সের আবেদন প্রভৃতি বিষয়গুলোর ব্যাপারে অনেকক্ষেত্রেই উদাসীন বাবা-মা। বাচ্চাদের যথেষ্ট সময় না দেবার জন্য তারা হয়ে যাচ্ছে এককেন্দ্রিক। ভাবনার স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ হচ্ছে না। চিন্তার বিস্তৃতি ঘটছে না। কারো সঙ্গে অনুভূতিগুলো ভাগাভাগিরও সুযোগ কম পাচ্ছে।

আসলে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার শুরু মুখস্থনির্ভর পদ্ধতি দিয়েই। ব্রিটিশ পর্ব থেকে পাকিস্তান পর্ব, এরপর স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। কিন্তু এখনো শিক্ষা, প্রশাসন, আইন-কানুনসহ অনেক ক্ষেত্রেই এখনো আমরা চলি, ব্রিটিশদের অনুসরণ করেই। এটা আমাদের জন্য দুর্ভাগ্যের নিঃসন্দেহে। কিন্তু পরিত্রাণ মিলছে না। শিক্ষা এর মধ্যে একটি পর্ব। ব্রিটিশরা পড়েছে মুখস্থনির্ভর পড়া। আমরা এখনো সেটাই অনুসরণ করছি। মুখস্থনির্ভর পড়াশোনায় নিরুৎসাহিত করতে বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষাবান্ধব ব্যক্তিত্ব নুরুল ইসলাম নাহিদ প্রবর্তন করলেন সৃজনশীল শিক্ষাব্যবস্থা। ফল উল্টো হলো। কাঙ্ক্ষিত ফল অধরাই রয়ে গেলো। বর্তমানে শিশু শ্রেণিতে ভর্তির সময় থেকে মুখস্থ পড়ার মূল্যায়ন করা হয়। কচি শিক্ষার্থীদের ভর্তি পরীক্ষা থেকেই মুখস্থনির্ভর পরীক্ষার গুরুত্ব শুরু হয়। কত সহজে, কত বিচিত্র উপায়ে মুখস্থ করা যায়, আমাদের শিক্ষক, অভিভাবকরা সে চিন্তায় ব্যস্ত। শিক্ষার্থীদের জন্য বাড়ছে নিত্যনতুন টিউশনি। সকালে এক শিক্ষক তো বিকালে আরেক বিষয়ের শিক্ষক। সন্ধ্যার পরে আবার আরেকজন। এমনভাবেই কেটে যায় শিক্ষার্থীদের সময়। আর এই যে সকাল-বিকাল পরিবর্তিত শিক্ষকদের হাতে থাকে একেক ধরনের গাইড বই। আর পরীক্ষার ব্যস্ততা তো রয়েছেই। প্রতিষ্ঠানে রয়েছে প্রতিদিনের লেকচারের উপর পরীক্ষা, বিভিন্ন অধ্যায়ের বিষয়ভিত্তিক পরীক্ষা, সাময়িক পরীক্ষা, সাপ্তাহিক পরীক্ষা, ত্রৈমাসিক পরীক্ষা, ষান্মাসিক পরীক্ষা, বার্ষিক পরীক্ষা ইত্যাদি। যে কোচিংয়ে শিক্ষার্থী পড়ছে, সেখানেও রয়েছে প্রতিদিনের টেস্ট। আবার বাড়ির টিউটর সেও দু'ঘণ্টা পড়ানো শেষে আধঘণ্টার টেস্ট নেয়। একজন শিক্ষার্থীর সঙ্গে পরীক্ষাভীতিও সমানতালে বেড়ে ওঠে। ক্রমাগত পরীক্ষা, পরীক্ষাভীতি, আর সর্বোচ্চ জিপিএ পাওয়ার প্রবণতাই এখন শিক্ষার্থীদের চোখে-মুখে ঘুরে-ফিরে। শিক্ষার্থীদের খেলাধুলার সময় নেই। সুযোগ নেই। শহরে বেড়ে ওঠা শিশুরা থাকছে বাসার ছোট্ট সীমায় আবদ্ধ। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাদের পড়াশোনার প্রতিষ্ঠানেরও খেলার মাঠ নেই। নিজেদের মেধার বিকাশে আয়োজন নেই। সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের ব্যবস্থা নেই।

আসলে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার বিচিত্রতা (!) পরিস্থিতিকে আরো জটিল করে তুলছে। একটি ছোট্ট দেশ। হাতের মুঠোয় পুরো দেশের জনতা। অথচ সেখানে অনেক পদ্ধতির শিক্ষাব্যবস্থা বিদ্যমান। সাধারণ শিক্ষাপদ্ধতি, মাদ্রাসা শিক্ষাপদ্ধতি, ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষাপদ্ধতি, কারিগরি শিক্ষাপদ্ধতি আরো কত কি! সাধারণের মধ্যে আবার ভাগ, একটি পর্যায়ে গিয়ে মানবিক, বাণিজ্য আর বিজ্ঞানবিভাগে শিক্ষার্থীরা বিভক্ত হয়ে পড়ে। সাধারণ পদ্ধতির একটি পর্যায় থেকে গিয়ে কারিগরি ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীরা অন্তর্ভুক্ত হয়। মাদ্রাসার তো রকমের শেষ নেই। হাফেজিয়া মাদ্রাসা, কওমী মাদ্রাসা, মাদ্রাসার সাধারণ পদ্ধতি, আরো কতক পদ্ধতি থাকতে পারে, যা আমি জানি না। এসব পদ্ধতির প্রত্যেকটির সিলেবাস আলাদা আলাদা রকমের। যতদূর জানি কওমী মাদ্রাসার শিক্ষাব্যবস্থায় তো আমাদের দেশ, দেশের ভাষা, সংস্কৃতি, অভ্যুদয়ের ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়গুলোকে পাত্তাই দেয়া হয় না। হাফেজিয়া মাদ্রাসায় কেবল কোরান মুখস্থ করার মধ্যেই আবদ্ধ তারা। সেখানে না কোরানের আরবি ভাষার অর্থ, না বাংলা ব্যাখ্যা কোনো কিছু শেখানো হয়। কচি বাচ্চারা মাদ্রাসার সাধারণ পদ্ধতিতে ইদানিং সাধারণ শিক্ষাপদ্ধতির সঙ্গে সমন্বয় করা হয়েছে। ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষাদান পদ্ধতি, তাদের পোশাক-আশাক, কথা-বার্তার ধরন, সংস্কৃতি সম্পূর্ণ আমাদের দেশের ইতিহাস-ঐতিহ্যের থেকে ভিন্ন।

আমাদের সময় সামনের দিকে এগিয়ে যাবার। স্বাধীনতার দীর্ঘ সময় পরে হলেও সময়োপযোগী পদক্ষেপের কারণে বর্তমানে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। উন্নয়নমুখী নানা পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। মানবজীবনের প্রতিটি স্তরে প্রয়োজনীয় উন্নয়ন অবকাঠামো এখন দেশে বিদ্যমান। এগুলো সরকারের সাফল্য নিঃসন্দেহে। কিন্তু এসবের প্রতিটিই মানবকেন্দ্রিক। সমাজের নাগরিক, শিক্ষার্থীরা যদি দেশ ও সমাজের ধ্যান-ধারণার বাইরে চলে যান, বিদেশি সংস্কৃতি ও ভাবনা লালন ধারণ করেন, তবে এসব উন্নয়নের সার্থকতা কোথায়। আমাদের সন্তানরা কি পড়ছে, কি সংস্কৃতি উদযাপন করছে, কাদের সঙ্গে মিশছে, কোথায় সময় কাটাচ্ছে, কোন্ ধ্যান-ধারণায় নিজেদের তৈরি করছে, তা যদি খেয়াল রাখতে না পারি, পিতামাতা, অভিভাবক শিক্ষক হিসেবে এ ব্যর্থতা অস্বীকার করি কিভাবে! একটি আদর্শ ও সমৃদ্ধ জাতি গঠনে একটি শিক্ষিত, জ্ঞানী, চিন্তাশীল প্রজন্ম দরকার। এ প্রজন্ম একটি আদর্শ শিক্ষাব্যবস্থা থেকে বের হয়ে আসতে পারে। সৃজনশীল এ প্রজন্ম গঠনের দায় পিতামাতা, অভিভাবক, শিক্ষক সকলের। সবার আগে তাই প্রয়োজন একটি আদর্শ শিক্ষা ব্যবস্থা এবং শিক্ষার সকল স্তরে সরকারের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ। একজন চাইলেই একটি স্কুল খুলতে যেনো না পারে, মন চাইল বিশ্ববিদ্যালয় খুলে বসলো— যিনি পড়াচ্ছেন তিনিই ডিগ্রি দিচ্ছেন, যাচাই-বাছাই করার প্রয়োজন হচ্ছে না। শিক্ষক ঠিকাদারি করছেন, পড়াচ্ছেন না, অভিভাবক আগের মতো অফিস থেকে ফিরে সন্তানকে নিয়ে না বসে অন্য কিছু করছেন, নানাভাবে অর্জিত টাকা তুলে দিচ্ছেন কোচিং ব্যবসায়ীর হাতে। দোকানি সদাই বিক্রি করে— কিভাবে বস্তুটি ব্যবহার করতে হয় তা শিখায় না, কোচিং ব্যবসায়ী ও একজন দোকানি আপনার সন্তানকে গভীর জ্ঞান দান করতে হলে তার ব্যবসা বন্ধ করতে হবে। কথাটি একবার ভেবেছেন কী? কেন কোচিং ব্যবসায়ী জ্ঞান দান না করে ফলাফল ভালো করায়?

● লেখক : সদস্য, বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন,
সাবেক উপাচার্য, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
ই-মেইল : skabir_ju@yahoo.com